بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ এপ্রিল, ২০২২ মোতাবেক ২২ শাহাদত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বর্তমানে আমরা রমযান মাস অতিবাহিত করছি আর প্রায় দুই দশক বা দু'পক্ষ শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রত্যেক মু'মিন এ মাসের কল্যাণ থেকে বেশি বেশি কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করে। রোযার আবশ্যকতার কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই আল্লাহ্ তা'লা রোযার এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের জন্য রোযাকে ফরয করার কারণ হল যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার। অতএব রোযা এবং রমযানের কল্যাণ থেকে তখনই আমরা কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব যদি রোযার পাশাপাশি আমরা আমাদের তাক্বওয়ার মানও উন্নত করি। সব ধরণের মন্দ বিষয় থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, রোযা হল ঢালস্বরূপ। তাহলে কি শুধু নামেমাত্র রোযা রাখলেই যথেষ্ট হবে? সেহরী ও ইফতারী করাই কি যথেষ্ট? আমাদের এতটুকু কাজই কি আমাদেরকে রোযার ঢালের পিছনে নিয়ে আসবে যে, আমরা সেহরী ও ইফতারী করেছি। না, বরং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এর যে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন তা হল, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর। অতএব, আমরা যদি আমাদের রোযা ও আমাদের রমযান মাসকে সেসব রোযা এবং রমযানে রূপ দিতে চাই যা হবে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আর (যার) প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা হয়ে যান তাহলে আমাদেরকে তা সেই মানে উপনীত করতে হবে যেমনটি খোদা তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন আর যার জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। তা হল আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করা আল্লাহ্ তা'লা তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন আর আমিও পূর্বে উল্লেখ করেছি । আমরা নিজেদেরকে মু'মিন বলি, মুসলমান বলি এবং এই দাবি করে থাকি যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ মেনে এবং তাঁর প্রতি নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করে এ বিষয়টিও মান্য করেছি যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মসীহ্ ও মাহ্দীর আগমনের কথা ছিল তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্তায় এসেছেন। ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কাজ এখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই মসীহ্ ও মাহ্দীর হাতেই সম্পন্ন হবে। অতএব, আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হল আমাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত চেতনা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট থেকে দিকনির্দেশনা নেয়া। কাজেই তিনি (আ.) তাক্বওয়া সম্পর্কে কী বলেছেন আমরা যদি তা দেখি তবেই তাক্বওয়া সম্পর্কে জানতে পারব। যেভাবে আমি বলেছি, আমরা এ দাবি করে থাকি যে, আমরা মুসলমান এবং আমরা ঈমানদারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত, এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তাহলে শোন! ঈমানের প্রথম ধাপ হল, মানুষের তাক্বওয়া অবলম্বন করা। আর এরপর তিনি (রা.) বলেছেন, তাক্বওয়া কী? এর উত্তর হল, সব ধরণের মন্দ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। এখন যদি আমরা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখবো, এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। খতিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, আমরা কি যথাযথভাবে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদান করছি? আমরা কি তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান করছি। তাক্বওয়া কী– এটি ততক্ষণ জানা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হবে। জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। কেননা জ্ঞান ব্যতীত কোন জিনিসই অর্জিত হতে পারে না আর মানুষ তা পেতেই পারে না। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য কী, বান্দার অধিকার কী, কী কী বিষয় আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন এবং কোন কোন কাজ করতে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন?– এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য বার বার কুরআন শরীফ পড়। তিনি (আ.) বলেন, আর (কুরআন শরীফ পড়ার সময়) তোমাদের উচিত মন্দকর্মের তালিকা প্রণয়ন করা আর এরপর খোদা তা'লার কৃপা ও সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করা যেন এসব পাপ থেকে মুক্ত থাক। তিনি (রা.) বলেন, এটি হবে তাক্বওয়ার প্রথম ধাপ।

অতএব, এই রমযানে আমরা কুরআন শরীফও পড়ছি আর (এ সময়) সাধারণত কুরআন শরীফ পড়ার প্রতি বেশি মনোযোগ থাকে। তাই এই চিন্তা নিয়ে পড়া উচিত যে, এর আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে ও সৎকর্ম করার চেষ্টা করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদেশ ও নিষেধ এবং ঐশী বিধিবিধানের বিশদ বিবরণ বিদ্যমান। অতএব আমাদেরকে এসব বিষয় দেখতে হবে, সেগুলো নিয়ে ভাবতে হবে এবং এগুলো পালন করতে হবে। এটি-ই একজন মু'মিনের পরিচয়। এ কথাটি তিনি (আ.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন যে, মুত্তাকী না হওয়া পর্যন্ত মানুষের ইবাদত ও দোয়ায় গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন; যেমন তিনি বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ মায়েদাঃ ২৮)। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ইবাদতই গ্রহণ করেন। সত্য কথা হল– মুত্তাকীদের নামায ও রোযাই গৃহীত হয়। এরপর তিনি (আ.) (এ প্রশ্নের) উত্তরও দিয়েছেন যে, ইবাদত গৃহীত হবার অর্থ কী এবং এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে। **"কবুলিয়্যত কাকে বলে?** এর উত্তর হল, আমরা যখন বলি নামায কবুল হয়ে গিয়েছে তখন এর অর্থ হল নামাযের ছাপ ও কল্যাণরাজি নামায আদায়কারীর মাঝে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কল্যাণরাজি ও লক্ষণাবলী সৃষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি নিছক মাথা ঠোকানো বৈ কিছু নয়।

অতএব, আমাদের দেখতে হবে আমাদের রমযান এবং আমাদের রোযা কি আমাদের এই মানদণ্ডে উপনীত করার চেষ্টা করছে?

তিনি (আ.) বলেন, পাপ-পঙ্কিলতা ও মন্দকর্মে যদি আগের মতই লিপ্ত থাকে তাহলে তোমরাই বল, এই নামায তার কী উপকার করল? যেসব পাপ ও মন্দকর্মে সে লিপ্ত ছিল নামাযের ফলে তা হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল, কেননা নামায হল তা করার এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তিনি (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মু'মিন হতে চায় তার জন্য প্রথম ও কঠিন ধাপই হল, পাপ থেকে বিরত থাকা আর এরই নাম তাক্বওয়া।

অতএব, আমাদের ইবাদত, আমাদের রোযা এবং আমাদের কুরআন শরীফ পাঠ যদি আমাদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধন না করে এবং তাক্বওয়া, যা অর্জন করা রোযার মূল উদ্দেশ্য তা অর্জনের জন্য যদি চেষ্টাই না করি তবে আমরা আমাদের রোযা এবং রোযা রাখার উদ্দেশ্য অর্জন করি নি। আমরা সেই ঢাল সম্পর্কে আলোচনা করেছি বটে, যে সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, রোযা হল ঢালস্বরূপ, কিন্তু আমরা সেই ঢাল ব্যবহারের পদ্ধতি শেখার চেষ্টা করি নি। আমরা সেহরী ও ইফতারী করার আয়োজন করেছি বটে, কিন্তু আমরা সেহরী ও ইফতারী খাওয়ার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করি নি। আমরা সারাদিন অভুক্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় পার করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা উপোস থাকার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করি নি যে উদ্দেশ্য তাক্বওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয় এবং যে তাক্বওয়া আমাদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল। অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, এটি হয়েছে, নাকি হয় নি?

তাক্বওয়া–সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরো কিছু উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি যেগুলো থেকে আমরা পথের দিশা পাই যে, প্রকৃত তাক্বওয়া কী এবং কোন ধরনের তাক্বওয়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান। এবিষয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

প্রকৃত তাক্বওয়া যার দ্বারা মানুষ বিধৌত ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং যার জন্য নবীগণ এসে থাকেন তা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا –এর দৃষ্টান্ত কালে-ভদ্রেই পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ, যে তাকে(অর্থাৎ নফসকে) পবিত্র করেছে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ দু–একজনই হবে যারা قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا–এর সত্যায়নকারী হবে।

পাক-পবিত্রতা খুবই ভালো জিনিস। মানুষ পাক-পবিত্র হলে ফিরিশতারা তার সাথে করমর্দন করে। মানুষের কাছে এর মূল্য নেই, অন্যথায় তার প্রতিটি পছন্দের জিনিসই বৈধ পন্থায় লাভ হওয়া সম্ভব। চোর সম্পদ লাভের জন্য চুরি করে কিন্তু সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে খোদা তা'লা তাকে অন্য কোন উপায়ে সম্পদশালী করে দেবেন।

এটি কেবল বাহ্যিক চুরি নয় বরং কতিপয় ব্যবসায়ী যারা মন্দ জিনিস বিক্রি করে তারাও একই কাজ করে।

একইভাবে ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, কিন্তু সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন উপায়ে তার বাসনা পূরণ করে দেবেন যার মাধ্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হবে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোন চোর-ই মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না এবং কোন ব্যভিচারী-ই মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।

অর্থাৎ হৃদয় যখন ঈমানশূণ্য হয়ে যায় তখনই মানুষ এ ধরণের কাজে লিপ্ত হয়। তিনি (রা.) বলেন,

ছাগলের সামনে বাঘ দাঁড়িয়ে থাকলে সে ঘাসও খেতে পারে না, তাহলে কি মানুষের মাঝে একটি ছাগলের সমান ঈমানও নেই?

মানুষ যখন বিভিন্ন ধরণের পাপ ও মন্দকর্মে লিপ্ত হয় তখন তার মাঝে এতটুকু অনুভূতি থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সর্বদা দেখছেন।

মূল বিষয় ও লক্ষ্য হল তাক্বওয়া, যাকে তা দেয়া হয় সে সবকিছু পেতে পারে। এছাড়া মানুষের পক্ষে সগীরা ও কবীরা গুণাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

অর্থাৎ (এছাড়া) ছোট ও বড় পাপ থেকে মানষের বাঁচা সম্ভব নয়।

মানবীয় সরকারের আইনকানুন (মানুষকে) পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে না, কেননা প্রশাসন সব সময় সাথে থাকে না যে, তাদের ভয় করবে। মানুষ নিজেকে একা মনে করে পাপ করে তা না হলে সে কখনোই এমন করত না। সে যখন নিজেকে একা মনে করে তখন সে নাস্তিক হয়ে থাকে।

তার মাঝে কোন ঈমান-ই থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয় হতে হারিয়ে যান এবং সে নাস্তিক হয়ে যায়।

তখন সে এটি মনে করে না যে, আমার খোদা আমার সাথে আছেন, আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। অন্যথায় সে যদি মনে করত খোদা আমাকে দেখছেন তাহলে সে কখনো পাপ করত না। তাক্বওয়ার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। এরই মাধ্যমে কুরআন আরম্ভ হয়েছে যে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ –এর মানেও তাক্বওয়া। কাজ মানুষ করলেও ভয়ের কারণে নিজের প্রতি তা আরোপ করতে সাহস করে না, বরং সেটিকে খোদার সাহায্য মনে করে আর তাঁর কাছেই ভবিষ্যতের জন্যও সাহায্য কামনা করে।

আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য চায়। পুণ্য করলেও (মনে করে না) এটি আমার যোগ্যতায় হয়েছে, আমার হৃদয় নেক অথবা আমি নেকীর অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছি। বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে তিনি আমাকে এই পুণ্য করার, নামায পড়ার ও দোয়া করার সামর্থ্য দান করেছেন। আবার দ্বিতীয় সূরাও هُدًى لِلْمُتَّقِينَ দ্বারা আরম্ভ হয়। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি সব ইবাদতই গৃহীত হয় যদি মানুষ মুত্তাকী হয়। তখন আল্লাহ্ তা'লা পাপের দিকে আহ্বানকারী সবকিছু সরিয়ে দেন।

অর্থাৎ যদি তাক্বওয়া থাকে তাহলে পাপের দিকে আহ্বানকারী সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্ তা'লা দূর করে দেন।

স্ত্রীর প্রয়োজন থাকলে স্ত্রী দান করেন, ঔষধের প্রয়োজন হলে ঔষধের ব্যবস্থা করে দেন, যে জিনিসেরই প্রয়োজন পড়ে তা দান করেন আর এমন জায়গা থেকে রিয্ক দেন যা সম্পর্কে সে কল্পনাও করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আরেকটি আয়াত রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (সূরা হামীম আস্ সাজদা: ৩১)। এর অর্থও মুত্তাকী। ثُمَّ اسْتَقَامُوا, অর্থাৎ তাদের জীবনে ভূমিকম্প এসেছে, পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে, ঝড়ঝঞ্জা এসেছে কিন্তু তাঁর সাথে সে যে এক অঙ্গীকার করেছে তা থেকে সে বিচ্যুত হয় নি।

বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্র সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। একবার ঈমান আনার পর সেই ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। এমন নয় যে, সামান্য সামান্য বিষয়ে ঈমানে দূর্বলতা প্রকাশ পাবে বা নড়বড়ে হয়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা যখন এরূপ করেছে এবং সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে তখন তারা এর এ প্রতিদান পেয়েছে যে, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থাৎ তাদের প্রতি ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়েছে

আর বলে, ভয় পেয়ো না; দুঃখিতও হয়ো না। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের অভিভাবক। وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ অর্থাৎ আর শুভ-সংবাদ দেয় যে, সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও। এই জান্নাত বলতে এখানে ইহজীবনের জান্নাতকে বুঝিয়েছে। যেমনটি কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে– ওয়া লিমান খাফা মাক্বামা রাব্বিহি জান্নাতান। অতঃপর রয়েছে, نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ অর্থাৎ আমরা তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক– ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও।

অতএব, কতই না সৌভাগ্যবান তারা যাদের বন্ধু ও অভিভাবক আল্লাহ্ হয়ে যান! যারা প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেন।

অতঃপর মু'মিন ও কাফিরের সফলতায় কি পার্থক্য হয়ে থাকে অর্থাৎ, মু'মিন তার সফলতাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে আর কাফের কোন দৃষ্টিতে দেখে– এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন,

সর্বদা এই নীতিটি দৃষ্টিপটে রাখবে যে, মু'মিনকে যে সফলতা দান করা হয় এতে সে লজ্জিত হয়।

কেন লজ্জিত হয়? কেননা তার পক্ষ থেকে এ অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়,

আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না অথচ ঐশী অনুগ্রহই যাবতীয় সবকিছু দিয়েছে। যা কিছুই পেয়েছি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের কল্যাণেই হয়েছে; এমন নয় যে আমার কোন গুণ, জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি বা সম্পদের কারণে অথবা আমার শারীরিক জোরে তা সম্ভব হয়েছে। না; বরং তা একান্তই খোদা তা'লার অনুগ্রহ। আর এই অনুভূতি জাগ্রত হলে সে খোদা তা'লার প্রশংসা করে যে, তিনি কৃপা করেছেন। এভাবেই সে অগ্রসর হতে থাকে এবং প্রতিটি পরীক্ষায় অবিচল থেকে ঈমান লাভ করে।

তিনি (আ.) বলেন,

স্মরণ রেখ! কাফিরের সাফল্য হল পথভ্রষ্টতা আর মু'মিনের সাফল্যের মাধ্যমে ঐশী অনুগ্রহরাজির দুয়ার উন্মোচিত হয়।

কাফির যেহেতু সর্বক্ষেত্রে আত্মঅহংকার করে, কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদ নেয় তাই সে ক্রমশঃ পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মু'মিন নিজের সবকিছুকে আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ মনে করে তখন তার প্রতি অনুগ্রহরাজীর দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে।

কাফিরের সাফল্য তাকে বিপথগামিতার দিকে নিয়ে যায় কেননা সে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না বরং আপন শ্রম, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং যোগ্যতাকে খোদা বানিয়ে নেয়, কিন্তু মু'মিন খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করে খোদা তা'লার সাথে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে আর এভাবে প্রত্যেক সফলতার পর খোদা তা'লার সাথে তার নতুন একটি সম্পর্কের সুত্রপাত ঘটে এবং তার জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا অর্থাৎ, খোদা তা'লা মুত্তাকীদের সাথে থাকেন। স্বরণ রাখা উচিত! কুরআন করীমে তাক্ওয়া শব্দটি বহুবার এসেছে; শতাধিক বার। এর

অর্থ পূর্বের শব্দের সাথে যুক্ত করে করা হয়; এখানে 'মাআ' শব্দ এসেছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদাকে প্রাধান্য দেয় খোদা তাকে প্রাধান্য দেন এবং পৃথিবীতে সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেন।

তিনি (আ.) বলেন, আমার ঈমান এটিই যে, যদি কোন ব্যক্তি ইহজগতে সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা থেকে রক্ষা পেতে চায় তবে তার জন্য একটি উপায়ই আর তা হল মুত্তাকী (খোদাভীরু) হয়ে যাওয়া। এরপর তার আর কোন কিছুর অভাব হবে না। সুতরাং মু'মিনের সফলতা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় আর সে সেখানেই স্থবির হয়ে যায় না।

মুত্তাকী ব্যক্তির জীবনে তাক্বওয়ার কার্যকারিতা ইহজগতেই আরম্ভ হয়ে যায়। এটি বাকী নয় বরং নগদ বিষয়। যেভাবে দেহে বিষ ও প্রতিষেধকের প্রভাব তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হয় অনুরূপভাবে তাক্ওয়ার প্রভাব পড়ে থাকে। অতএব যদি সৎকর্ম, ইবাদত, পুণ্যকর্ম করা সত্ত্বেও মানবীয় অবস্থায় পরিবর্তন সাধিত না হয় তবে তা চিন্তার বিষয়! অনেকেই প্রশ্ন লিখে পাঠায় যে, কিভাবে বুঝা যাবে? সুতরাং এভাবে বুঝা যায় যে, সৎকর্মের প্রতি যদি বেশি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, আল্লাহ্র দিকে যদি অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয় তবে সেই কাজ আল্লাহ্র জন্য করছে আর আল্লাহ্ তাতে কল্যাণ দান করেন।

তাক্বওয়ার পথ চিহ্নিত করতে গিয়ে ও সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন,মানুষের সব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথসমূহ অনুসরণের মাঝে। তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথ হল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের অনুপম ছাপ এবং দৃষ্টিনন্দন বৈশিষ্ট্য।
তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথ কী? আধ্যাত্মিকভাবে তার মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

এটি স্পষ্ট যে, খোদা তা'লার আমানতসমূহ এবং ঈমানী অঙ্গীকারসমূহের বিষয়ে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা এবং আপাদমস্তক যতগুলো অঙ্গপ্রতঙ্গ রয়েছে যাতে বাহ্যিকভাবে চোখ, কান, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তর্ভূক্ত এবং অভ্যন্তরীনভাবে হৃদয় ও অন্যান্য শক্তিনিচয় এবং স্বভাব চরিত্র রয়েছে- এগুলোকে সামর্থানুযায়ী উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র নির্বেশেষে ব্যবহার করা এবং অবৈধ ক্ষেত্র থেকে বিরত থাকা এবং এসবের গোপন আক্রমনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং অপরদিকে বান্দার অধিকারের বিষয়েও সতর্ক থাকা।

এগুলো হচ্ছে ঈমানী অঙ্গীকার যা আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছি। স্বীয় চোখকেও সঠিক স্থানে ব্যবহার করতে হবে, কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে হবে, মন্দকাজ থেকে বাঁচাতে হবে। কানকেও কুকথা শ্রবণ থেকে বাঁচাতে হবে। হাত পা দ্বারাও পূণ্য কাজ করতে হবে। হৃদয়ে যেসব বাজে চিন্তা ভাবনা রয়েছে সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে এবং সেজন্য বেশী বেশী ইস্তেগফারও করা উচিত। অন্যান্য শক্তিসামর্থ রয়েছে। সেগুলোকেও কাজে লাগাতে হবে। স্বীয় চরিত্রকে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে। এগুলো হচ্ছে ঈমানী অঙ্গীকার যা মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সাথে করে থাকে। তিনি বলেন, এগুলোকে তোমাদের পূর্ণ করতে হবে। অপরদিকে বলেছেন, বান্দার অধিকার আদায়েও যত্নবান থাকতে হবে। ঐসব জিনিস তো তোমাদের হয়ে গেছে এখন বান্দার অধিকারও আদায় করতে হবে। যদি এ অধিকার আদায় হয় তবে এটি ঐ পথ যার সাথে

মানুষের সব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্বন্ধযুক্ত। যখন আল্লাহ্‌র অধিকারও আদায় হয়ে যায় এবং বান্দার অধিকারও আদায় হয়ে যায় তখন মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

খোদা তা'লা কুরআন শরীফে তাক্বওয়াকে পোষাক নামে অভিহিত করেছেন। যেমন **'লিবাসুত্তাকওয়া'** (অর্থাৎ তাক্বওয়ার পোষাক) কুরআনেরই একটি শব্দ। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও সৌকর্য তাক্বওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। আর তাক্বওয়া হচ্ছে, খোদার সব আমানত ও ঈমানী অঙ্গিকার এবং অনুরুপভাবে সৃষ্টির সব আমানত ও অঙ্গিকার যথাসম্ভব পালন করা। অর্থাৎ এসবের সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর অংশগুলোও যতদূর সম্ভব পালন করা। ইবাদত আত্মসুদ্ধি এবং লোকদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'লার যেসব আদেশ রয়েছে সেগুলোর গভীরতায় গিয়ে তা আদায় করার চেষ্টা কর।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ্‌ ও বান্দার অধিকারের সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর দিকগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষন পর্যন্ত তাক্বওয়ার মান অর্জিত হবেনা। অতএব, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদেরকে স্বরণ রাখতে হবে। ইবাদতের পাশাপাশি বান্দার অধিকার আদায় না হলে তা বিন্দুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না। আবার শুধু সৃষ্টির কিছু অধিকার আদায় করা আর খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়া যেভাবে লোকেরা বলে যে আমরা বান্দার অধিকার আদায় করছি এটিও তাক্বওয়ার পথে বিচরনকারী বানাতে পারেনা। একজন সত্যিকার মুমিনের জন্য উভয় অধিকার আদায়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

অতঃপর বিদাতের বিস্তৃতি ও তাক্বওয়াশূন্যতার উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, সকল ফির্কা ও দলে হাজারো প্রকৃতির বিদাত স্ব স্ব রুপে সৃষ্টি হয়েছে। তাক্বওয়া ও পবিত্রতা যা মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, যেজন্য মহানবী (স.) বিপজ্জনক বিপদাবলী সহ্য করেছেন, যেগুলোকে নবুয়তের হৃদয় ব্যাতীত অন্য কেউ সহ্য করতে পারত না সেগুলো আজ হারিয়ে গেছে। জেলখানায় গিয়ে দেখ, বেশিরভাগ অপরাধীরা কোন দলের? অর্থাৎ, মসীহ মওউদ (আ.) বলছেন,

মুসলমান অধিক সংখ্যায় পাপাচারে লিপ্ত। আমি পূর্বেও বলেছি ঘানায় আমাদের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি বলতেন, আমাদের এক মিটিংয়ে কথা হচ্ছিল যে আমাদের জেলখানাগুলোতে অধিকাংশ অপরাধী হল মুসলমান। তিনি বলেন, আমি আহমদী এবং আমি এই চ্যালেঞ্জ করছি যে, তোমরা দেখে নিতে পার এসকল মুসলমানের মাঝে কোন আহমদী নেই আর যদি থেকেও থাকে নামে মাত্র হবে। যখন অনুসন্ধান করে দেখা হল, তখন এটিই সঠিক প্রমাণিত হল। সুতরাং প্রকৃত মুমিন, প্রকৃত আহমদীর লক্ষণ তো এটিই আর এটি তবলীগের অনেক বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যদি এ বিষয়টিকে আমরা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখি এবং প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক কাজে, নিজেদের ব্যবসা বানিজ্যে, নিজেদের চাকুরী প্রভৃতি, নিজেদের দৈনন্দিন বিষয়াদিতে লোকদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের উন্নত চরিত্র প্রদর্শনকারী হই, আমাদের ইবাদতের মান উন্নয়নকারী হই, হৃদয়ে তাক্বওয়া সৃষ্টির বিষয়ে সচেষ্ট থাকি, আল্লাহ তা'লার ভয় হৃদয়ে লালনকারী হই তাহলে এটি যেখানে আমাদের সংশোধনের কারণ হবে সেখানে নীরব তবলীগের মাধ্যম হবে।

তিনি (আ.) বলেন, ব্যভিচার, অধিকার হরণ এবং অন্যান্য অপরাধ এত বেশি পরিমাণে হচ্ছে, যেন ধরে নেয়া হয়েছে, খোদার কোন অস্তিত্বই নেই। যদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে বিরাজমান নোংরামী ও রোগব্যধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় তাহলে একটি মোটা পুস্তক তৈরি হয়ে যাবে। প্রত্যেক বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ জাতির বিভিন্ন মানুষের অবস্থা দেখে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, সেই তাক্বওয়া যা কুরআন করীমের উদ্দেশ্য ছিল, যা প্রকৃত সম্মানের কারণ এবং সাধুতার মাধ্যম ছিল তা আজ বিদ্যমান নাই। কুরআন করীম তাক্বওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য এটিই ছিল যা মুসলমানদের মাঝে হারিয়ে গেছে।

তিনি (আ.) বলেন, ব্যবহারিক অবস্থা যা ভাল হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল এবং যা মুসলমান ও অন্যদের মাঝে পার্থক্যসূচক মাপকাঠি ছিল তা দুর্বল ও অকেজো হয়ে গেছে। যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে কী তবলীগ হবে এবং মুসলমানদেরই বা কী প্রভাব পড়বে?পৃথিবীতে এখন এর পরিণামই আমরা দেখছি আর এর সমাধান কেবল আহমদীদের কাছেই রয়েছে। যদি আমরাও নষ্ট হয়ে যাই তাহলে কে সামলাবে? আল্লাহ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে আল্লাহ তা'লার যে প্রতিশ্রুতি তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, কিন্ত আমরা যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই তাহলে আল্লাহ তা'লা অন্য কোন জাতিকে সৃষ্টি করবেন এবং তাদের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। আমাদের সমাজের অবস্থা যদি এমন হয়ে যায় যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বর্ণনা করেছেন তাহলে আমাদের নিজেদের পুণ্য ও তাক্বওয়ার মান সম্পর্কে কত বেশি চিন্তা করা উচিত এবং নিজেদের বংশধরের পুণ্য এবং তাক্বওয়ার মান সম্পর্কে কত বেশি চিন্তা করা উচিত।

তিনি (আ.) এ কথাও বলেন, তাক্বওয়া এটি নয় যে, আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহরাজী থেকে লাভবান হবে না, বরং এসব থেকে কল্যাণমন্ডিত না হলে এটিও তাক্বওয়া হতে বিচ্যূতি। কতিপয় তথাকথিত বুযুর্গ এবং পীর ফকির লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে সাদামাটা পোশাক পরিধান করে এবং বিস্বাদ খাবার গ্রহণ করে এবং প্রকাশ করতে চায় যে, আমরা মুত্তাকী এবং অনেক পুণ্যবান। তিনি বলেন, স্বরণ রেখো! মানুষের সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় দোয়া করতে থাকা উচিত এবং দ্বিতীয়ত **আম্মা বিনিমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস** এর ওপর আমল করা উচিত। খোদা প্রদত্ত অনুগ্রহরাজী বর্ণনা করা উচিত, এর উল্লেখ করা উচিত, এগুলো প্রকাশ করা উচিত। অনুগ্রহরাজী প্রকাশ করলে খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। তার আনুগত্য ও অনুগত হওয়ার জন্য এক ধরণের উদ্দিপনা সৃষ্টি হয়। তাহদীসের অর্থ এটি নয় যে, মানুষ কেবল মৌখীকভাবে বলতে থাকবে বরং দেহেও এর কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া উচিত। উদাহরণস্বরুপ এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'লা উন্নত মানের পোশাক পরিধান করার সামর্থ দিয়েছেন, কিন্তু সে সর্বদা নোংরা ময়লা কাপড় পরিধান করে এ মানসে যে তাকে যেন করুনার পাত্র মনে করা হয় অথবা তার স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা যেন কারো সামনে প্রকাশ না পায়,এমন ব্যক্তি পাপ করে কেননা সে খোদা তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহকে লুকাতে চায়।

এবং কপটতার আশ্রয় নেয়, প্রতারণা করে আর ভ্রান্তিতে নিপতিত করতে চায়। এটি মু'মিনের শোভা পায় না।

মু'মিন এরূপ হয় না।

মহানবী (সা.)-এর রীতি সর্বসাধারণের সামনে ছিল। অর্থাৎ, যা কিছু সহজলভ্য তার সবই তিনি গ্রহণ করতেন। এমন নয় যে, একদিকে বেশি ঝুঁকে যাবেন। উন্নত পোশাক পেলে উন্নত পোশাকও পরিধান করেন, তা না থাকলে সাধারণ পোশাকও পরিধান করেছেন। তিনি (সা.) যা পেতেন তা-ই পরিধান করতেন, মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। যে কাপড়ই দেয়া হতো তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর (তিরোধানের) পর কিছু লোক বৈরাগ্যের মাঝে বিনয় নিহিত জ্ঞান করেছে। কতিপয় দরবেশকে দেখা গেছে যে, তারা মাংসে মাটি মিশিয়ে খেতো। দরবেশ হওয়ার দাবি করতো আর মাংসে বালি মিশিয়ে খেতো। (এমনই) এক দরবেশের কাছে এক ব্যক্তি যায়। সে অর্থাৎ দরবেশ তার ভক্তকে বলে অতিথিকে খাবার খাওয়াও। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ অতিথি জোর দেয় যে, পীর সাহেব আমি তো আপনার সাথেই খাবার খাব। অবশেষে সে যখন সেই দরবেশের সাথে খাবার খেতে বসে তখন তার জন্য নীম এর বড়ি বানিয়ে পরিবেশন করা হয়। নীম এমন একটি গাছ যার পাতা অনেক তিক্ত হয়ে থাকে আর এর যে ফল হয় তা-ও অনেক তিক্ত হয়ে থাকে। সেটির খাবার প্রস্তুত করে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়, (যা ছিল) তিক্ত খাবার। সেটি মোটেই সুস্বাদু ছিল না। সুস্বাদু হওয়া তো দূরের কথা, সেটি ছিল ভয়াবহ তিক্ত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক এরূপ বিষয়াদি অবলম্বন করে আর তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মানুষকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব মানানো। কিন্তু ইসলাম এমন বিষয়াদিকে উন্নত শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত করে না। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হল তাক্বওয়া, যার ফলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, যার ফলে ফিরিশতাদের সাথে বাক্যালাপ হয়, খোদা তা'লা সুসংবাদে ভূষিত করেন। আমরা এরূপ শিক্ষা প্রদান করি না, কেননা এটি ইসলামী শিক্ষার বিরোধী বিষয়। পবিত্র কুরআনে তো كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ (সূরা মু'মিনূন: ৫২) অর্থাৎ পবিত্র বস্তু হতে আহার কর– এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর এরা তৈয়্যব তথা ভালো জিনিসে মাটি মিশিয়ে সেটিকে খারাপ করে তুলে। এমন রীতিনীতি ইসলাম আসার বহু পরে সৃষ্টি হয়েছে। এসব লোক মহানবী (সা.)-এর (শিক্ষার) সাথে সংযোজন করে থাকে। ইসলাম এবং পবিত্র কুরআনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। তারা পৃথকভাবে নিজেদের শরীয়ত বানিয়ে নেয়। আমি একে একান্ত তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমাদের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব যত দূর সম্ভব মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ এবং এর বিপরীতে একটি পদক্ষেপও গ্রহণ না করার মাঝে নিহিত।

এটি তো ছিল পানাহার সংক্রান্ত বিষয়। এরপর দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তিনি বলেন, অনুরূপভাবে নারী ও শিশুদের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি রয়েছে, নিজ গৃহে মানুষের যে ব্যবহার হয়ে থাকে সে সম্পর্কেও তিনি বলে দিয়েছেন যে, নারী ও শিশুদের সাথে সম্পর্ক এবং সামাজিক বিষয়াদিতে মানুষ ভুল করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। সোজা রাস্তা থেকে সরে গেছে। পবিত্র কুরআনে লেখা আছে যে, عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (সূরা আন্ নিসা: ২০) কিন্তু এখন এর বিরোধী কাজ হচ্ছে। ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা তো দূরের কথা কোন কোন ঘরে

অত্যাচার হচ্ছে নারীদের প্রতি। অতএব সামর্থ্য থাকলে ভালো পোশাক পরিধান করা, সামর্থ্য থাকলে ভালো খাবার খাওয়া, তাক্বওয়ায় ঘাটতি সৃষ্টি করে না, বরং (তা) বৃদ্ধি করে। অধিকন্তু পারিবারিক রীতিনীতির বিষয়েও বলেছেন যে, নিজ স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করাও আবশ্যক। নিজ সন্তানদের দেখাশোনা করা, তাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করা, তাদের সঠিক তরবিয়ত করাও আবশ্যক। এটিও তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত আর এটি পবিত্র কুরআনেরও নির্দেশ।

অতএব, হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দাদের অধিকার– উভয়টি প্রদান করা আবশ্যক। অতঃপর তিনি আরো একটি বিষয় বর্ণনা করেন যে, মুত্তাকীকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আলো প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

প্রকৃত তাক্বওয়া এবং অজ্ঞতা পাশাপাশি থাকতে পারে না। প্রকৃত তাক্বওয়ার মাঝে একটি জ্যোতি বিরাজ করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (সূরা আল্ আনফাল: ৩০)

وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ (সূরা আল্ হাদীদ: ২৯)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি মুত্তাকী হওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাক এবং আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তাক্বওয়ার বৈশিষ্ট্য ধারণের ক্ষেত্রে অবিচল ও প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে করবেন। আর সেই পার্থক্য হল, তোমাদেরকে এক জ্যোতি প্রদান করা হবে যার সাহায্যে তোমরা তোমাদের সমস্ত পথ চলবে। অর্থাৎ, সেই জ্যোতি তোমাদের সমস্ত কর্ম, কথা, শক্তিনিচয় ও ইন্দ্রিয়ে সঞ্চালিত হবে। তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের অনুমানভিত্তিক কথাতেও জ্যোতি বিরাজ করবে।

আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী যে পরিচালিত হয় তার দ্বারা কোন ভুল কাজ সংঘটিত হতেই পারে না। যদি হয়েও যায় তবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'লা সংশোধনের প্রতিও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ইস্তেগফার করার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা মনোযোগ আকৃষ্ট করবেন। তিনি বলেন,

তোমাদের সকল অনুমানভিত্তিক কথাতেও জ্যোতি থাকবে, তোমাদের চোখেও জ্যোতি বিরাজ করবে, তোমাদের কানে, তোমাদের কথায়, তোমাদের বিবৃতিতে, তোমাদের প্রতিটি গতি ও স্থিতিতে জ্যোতি থাকবে। (এক কথায়) যেসব পথে তোমরা চলবে সেগুলো জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে। এক কথায় তোমাদের যত পথ আছে তথা তোমাদের শক্তিবৃত্তি ও তোমাদের ইন্দ্রিয়ের যত পথ রয়েছে তার সবই নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তোমরা আপাদমস্তক জ্যোতির মাঝেই বিচরণ করবে। তোমাদের যতগুলো পথ রয়েছে তা সবই নেকীর দিকে পরিচালনাকারী পথ হবে। তোমাদের শক্তিবৃত্তিগুলো পুণ্যকাজে নিয়োজিত থাকবে। তোমাদের সকল চিন্তাভাবনা ও কল্পনাও নেক হয়ে যাবে। পাপের চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এমন সমাজ গঠিত হলে তা নিশ্চিতরূপে মুত্তাকীদের সমাজ হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আদি থেকে ঐশী রীতি এটাই যে, এই সমস্তকিছু পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরই লাভ হয়। ভয়, ভালোবাসা এবং মূল্যায়নের মূল হল পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান। অতএব

যাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয় তাকে ভয় এবং ভালোবাসাও পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হয়। যাকে ভয় এবং ভালোবাসা পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হয়েছে তাকে প্রত্যেক গুনাহ থেকে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে, যা ঔদ্ধত্যের কারণে সৃষ্টি হয়। অতএব এই পরিত্রাণ লাভের জন্য আমরা কোন রক্তেরও মুখাপেক্ষী নই, কোন ক্রুশেরও আমাদের প্রয়োজন নেই আর না আমাদের কোন প্রায়শ্চিত্বের প্রয়োজন রয়েছে, বরং আমরা কেবল একটি কুরবানীর আকাঙ্ক্ষী আর তা হল স্বীয় অবাধ্য প্রবৃত্তির কুরবানী। আমাদের প্রকৃতি এটির প্রয়োজন অনুভব করেছে। এমন কুরবানীর অপর নাম হল ইসলাম।

প্রবৃত্তির কুরবানী করা তাক্বওয়ার পথে চলার কারণ হয় এবং এরই নাম ইসলাম।

ইসলামের অর্থ হল, জবাই হবার জন্য ঘাড় সামনে রেখে দেয়া। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে স্বীয় আত্মাকে খোদার দরবারে সমর্পণ করা। এই প্রিয় নামটি শরীয়তের প্রাণ এবং সকল (ধর্মীয়) শিক্ষার প্রাণ। জবাই হবার জন্য স্বেচ্ছায় ও সানন্দ্যে গর্দান রেখে দেয়া পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও প্রেমের দাবি রাখে। আর পরিপূর্ণ ভালোবাসা পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের দাবি করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিস সম্বন্ধে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হবে ততক্ষণ ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে না।

অতএব, ইসলাম শব্দটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃত কুরবানীর জন্য পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসার প্রয়োজন, অন্য কিছুর প্রয়োজনীয়তা নেই। আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ (সূরা আল্ হাজ্জঃ ৩৮) অর্থাৎ, তোমাদের কুরবানীর মাংসও আমার কাছে পৌঁছে না আর রক্তও না, বরং কেবল এই কুরবানী আমার নিকট পৌঁছায় আর তা হল, তোমরা আমাকে ভয় করবে এবং আমার সন্তুষ্টির খাতিরে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে।

অতএব, এটি হল তাক্বওয়ার সেই মানদণ্ড যা খোদা তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন, যা খোদার রসূল (সা.) আমাদের নিকট চান, যা যুগ-ইমাম আমাদের নিকট আশা রাখেন। এ বিষয়ে বারংবার কুরআন শরীফে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটি অর্জন করার জন্য রমজান মাসে রোযা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান হবে যারা এই চিন্তাচেতনার সাথে চেষ্টা করবে যে, উক্ত তাক্বওয়া অর্জনের জন্য রমজানের অবশিষ্ট রোযাগুলো আমরা অতিবাহিত করব আর যেগুলো অতিবাহিত করেছি আল্লাহ্ তা'লা করুন সেগুলোও যেন সেভাবেই অতিবাহিত হয়ে থাকবে। নিজেদের প্রতিটি কথা ও কর্মকে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করে পরিচালিত করতে হবে।

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, মানুষ আপত্তি উত্থাপন করে যে, আপনি মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, কিন্তু আপনি তো সৈয়্যদ নন। আর একজন সৈয়্যদ একজন উম্মতী সদস্যের হাতে বয়আত কীভাবে করতে পারে?

কিছু সৈয়্যদ বংশোদ্ভূত লোক এবং সৈয়্যদদেরকে উচ্চ মর্যাদা দানকারী লোকজন এখনও এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, সৈয়্যদদের অসাধারণ মর্যাদা রয়েছে, তাহলে একজন সৈয়্যদ এমন ব্যক্তির হাতে বয়আত কীভাবে করতে পারে যে সৈয়্যদ নয়। একইভাবে বর্তমানে কিছু সংখ্যক আরবের মাঝেও এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে যে, মসীহ্ মওউদের আসার থাকলে তো আরবদের মাঝে হবার কথা, অনারবদের মাঝে তিনি কীভাবে আসলেন, এটা আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি? তারা কুরআন করীম পাঠ করে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে প্রণিধান করে না, এর উত্তর সেখানে পূর্বেই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই পদমর্যাদা আমি স্বয়ং প্রদান করে থাকি। বান্দারা এই মর্যাদা বণ্টনের কেউ নয়। যাহোক তিনি বলেন,

খোদা তা'লা কেবল দৈহিক অবয়ব বা বংশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হন না। তাঁর দৃষ্টি সর্বদা তাক্বওয়ার প্রতি থাকে। إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (সূরা হুজুরাতঃ ১৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্য হতে অধিক সম্মানিত সে-ই যে তোমাদের মাঝে অধিক মুত্তাকী। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা গর্ব যে, আমি সৈয়্যদ বা মুঘল বা পাঠান বা শেখ বংশের সদস্য। যদি অভিজাত বংশের সদস্য হওয়ার কারণে কেউ গর্ব করে তাহলে এই গর্ব সম্পূর্ণ বৃথা। মৃত্যুর পর সকল জাতিগত গর্ব শেষ হয়ে যায়। খোদা তা'লার নিকট জাতীয়তার কোন মূল্য নেই এবং কোন ব্যক্তি নিছক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হবার কারণে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। মহানবী (সা.) তার কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে ফাতেমা! তুমি নবীর দুহিতা হওয়া নিয়ে গর্ব করো না। আল্লাহ্ তা'লার নিকট বংশমর্যাদার কোন মূল্য নেই।

অতএব, যেখানে হযরত ফাতেমা (রা.)'র জন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে আর কে এর বাহিরে থাকতে পারে?

সেখানে (পরকালে) যে মর্যাদা লাভ হয় তা তাক্বওয়ার মাপকাঠিতে লাভ হয়। বিভিন্ন গোত্র ও জাতিগত বিভক্তি কেবল জাগতিক পরিচয় ও ব্যাবস্থাপনার খাতিরে। খোদা তা'লার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা তাক্বওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় এবং শুধুমাত্র তাক্বওয়া-ই উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়ে থাকে। কেউ যদি সৈয়্যদ বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টান হয়ে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করে এবং খোদা তা'লার আদেশসমূহের অবমাননা করে, তবে কি কেউ বলতে পারবে যে, সেই ব্যক্তি মহনবী (সা.)-এর বংশোদ্ভূত হবার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে? إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (সূরা আলে ইমরানঃ ২০)। আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রকৃত ধর্ম, যেটি মুক্তির কারণ, সেটি হল ইসলাম। যদি কেউ খ্রিষ্টান, ইহুদি অথবা আর্য হয়ে যায় তবে সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়। খোদা তা'লা বংশীয় ও জাতীয় বৈষম্য পদদলিত করেছেন। পরিচয় ও জাগতিক ব্যবস্থাপনার খাতিরে গোত্রীয় ব্যবস্থা মাত্র । তবে আমরা গভীর প্রণিধান করে দেখেছি যে, খোদা তা'লার নিকট যে মর্যাদা লাভ হয় তার মূল কারণ তাক্বওয়া। যে ব্যক্তি খোদভীরু, সে জান্নাতে

প্রবেশ করবে। খোদা তা'লা এমন ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে একজন মুত্তাকী ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে সম্মানিত। অতঃপর এই যে তিনি বলেছেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ মায়েদা: ২৮)। অর্থাৎ, কর্ম ও দোয়া মুত্তাকীদেরই গৃহীত হয়। এটি বলেন নি যে, **'মিনাস সাইয়্যেদিন'** (অর্থাৎ সৈয়্যদদের কাছ থেকে গৃহীত হবে)। আরেক স্থানে মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেছেন, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত্ তালাক: ৩-৪)। অর্থাৎ মুত্তাকী প্রত্যেক দুঃখ কষ্টের পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। তাকে এমন স্থান থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করা হয় যার ধারণাও তার থাকে না। এখন বল, এই অঙ্গীকার সৈয়্যদদের সাথে করা হয়েছে নাকি মুত্তাকীদের সাথে? এরপর বলা হয়েছে, মুত্তাকীরাই আল্লাহ্ তা'লার ওলী বা বন্ধু হয়ে থাকে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'লার ওলী (তথা বন্ধু) হয়ে থাকে। সৈয়্যদদের জন্য এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নি। বেলায়েতের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা আর কী হতে পারে? এবং তা-ও মুত্তাকীরাই লাভ করেছে। অনেকে বেলায়েতকে নবুয়্যতের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছে আর বলে যে, নবীর বেলায়াত তার নবুয়্যতের চেয়ে বড়। নবীর সত্তা প্রকৃতপক্ষে দুটি জিনিসের মাধ্যমে গঠিত তথা নবুয়্যত এবং বেলায়েত। নবুয়্যতের মাধ্যমে (নবী) সেই বিধিবিধান এবং শরীয়ত মানুষকে প্রদান করে এবং বেলায়েত খোদা তা'লার তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ। একথা বলেন নি যে, 'হুদাল্লিস সাইয়্যেদীন'। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা তাক্বওয়া (দেখতে) চান। তবে হ্যাঁ, সৈয়্যদরা তাক্বওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার অধিক মুখাপেক্ষী কেননা তারা মুত্তাকীদের সন্তান।

তাদের জন্য আবশ্যক তাক্বওয়া অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া, এমন নয় যে সৈয়্যদ হওয়া তাদেরকে কোনো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করছে।

তিনি (আ.) বলেন, তাই তাদের জন্য আবশ্যক হল, সৈয়্যদদের অধিকারের নামে খোদা তা'লার সাথে বিবাদ করার পরিবর্তে তাদের সর্বাগ্রে বয়আ'ত করা উচিত। তিনি (আল্লাহ্) যাকে ইচ্ছা (নিজ মনোনয়ন) প্রদান করেন। ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ। তাদের এ কথাটি ইহুদীদের কথার সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা বলে, বনী ইসমাঈল কেন নবুয়্যত লাভ করেছে? তাদের জানা নেই- تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ। কেউ খোদা তা'লার বিরোধিতা করলে সে তো মরদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

উক্ত আয়াতের অর্থ হল, এসব দিন আমরা মানুষের মাঝে অদল-বদল করে থাকি। এটি আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত।

তিনি (আ.) বলেছেন, কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে দাড়ালে সে প্রত্যাখ্যাত । আল্লাহ্‌র কাছে সবাই জবাবদিহি করতে বাধ্য কিন্তু আল্লাহ্‌ জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

তার (আ.) দাবীর বিষয়ে আপত্তির জবাবে তিনি (আ.) বলেন,

'মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হলেন এবং তিনি (নবুয়্যতের) দাবী করলেন, সমসাময়িক সমাজে অনেকের দৃষ্টিতে বহু ইহুদী আলেম মুত্তাকী এবং ধর্মভীরু হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু তারা খোদা তা'লার দৃষ্টিতেও মুত্তাকী হবে- এটি আবশ্যক নয়। খোদা তা'লা তো ঐসকল মুত্তাকীর কথা বলছেন যারা তাঁর দৃষ্টিতে তাক্বওয়াপরায়ন এবং নিষ্ঠাবান। তারা যখন মহানবী (সা.)-এর দাবী শুনল, লোকদের মাঝে তাদের যে সম্মান ও প্রভাব ছিল তাতে ঘাটতি আসতে দেখে দম্ভের সাথে (গ্রহণ করতে) অস্বীকার করল এবং সত্য মানা পছন্দ করে নি। এখন দেখো! লোকদের দৃষ্টিতে তারাও তো মুত্তাকী বলেই বিবেচিত ছিল কিন্তু তারা প্রকৃত মুত্তাকী ছিল না। প্রকৃত মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যার সম্মান ধুলিস্যাৎ হলেও এবং হাজার লাঞ্ছনার মুখোমুখী হলেও আর প্রাণ নাশের আশংকা থাকলেও এবং ক্ষুধা ও অনাহারের অবস্থা আসলেও সে আল্লাহ্‌ তা'লার ঐ সকল ক্ষতি সহ্য করে কিন্তু সত্যকে কখনও গোপন করে না। 'মুত্তাকী' শব্দের অর্থ অদৌ তা নয় যা বর্তমান যুগের মৌলবীরা আদালতে বর্ণনা করে অর্থাৎ কথা-কাজে মিল না থাকলেও আর সে মিথ্যা বললেও আর চুরি করলেও যদি সে ব্যক্তি মৌখিকভাবে মানে তাহলে সে মুত্তাকী। অর্থাৎ বুলিসর্বস্ব মুসলমান হওয়ার দাবী করাই তাক্বওয়া নয়। তাক্বওয়ার অনেক স্তর আছে আর যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরিপূর্ণ মুত্তাকী হয় না। প্রত্যেক জিনিস তখনই কার্যকর হয় যখন তার সম্পূর্ণটা ব্যবহার করা হয়। যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসা লাগে তাহলে এক টুকরো রুটি এবং এক ফোঁটা পানি দ্বারা তার পেট ভরবে না।

[মৌলবীরা নিজেদের জ্ঞানের বহর জাহির করে- এটি তাক্বওয়া নয়। তাক্বওয়া তো কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। কাউকে মৌলবী বললে অথবা বড় আলেম হলেই তাক্বওয়া সৃষ্টি হয়ে যায় না।]

তিনি (আ.) বলেন, কোন ব্যক্তির যদি ক্ষুধা এবং পিপাসা লাগে তাহলে এক টুকরো রুটি এবং এক ফোঁটা পানি খেলেই তার পেট ভরবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রাণে বাঁচবে না যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণরূপে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। তাক্বওয়াও ঠিক তেমন-ই অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণরূপে সব দিক দিয়ে অবলম্বন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারে না। একথাটিকে যদি সঠিক মনে না করা হয় তাহলে আমরা একজন কাফেরকেও মুত্তাকী বলতে পারি কেননা তাক্বওয়ার কোনো না কোনো দিক তথা গুণাগুন তার মাঝে তো থাকবেই।

কোনো না কোনো পুণ্যকর্ম তো সে করেই- কিন্তু এতে সে মুত্তাকী হয়ে যায় না।

আল্লাহ্‌ তা'লা শুধুমাত্র অমানিসা দিয়ে কাউকে সৃষ্টি করেন নি।

এটি হতে পারে না যে এক ব্যক্তির মাঝে কেবল পাপই সৃষ্টি করেছেন, ভাল গুনাবলীও রয়েছে।

কিন্তু এ পরিমান তাক্বওয়া কোন কাফেরের মাঝে থাকলেও তা তাকে কোনভাবে লাভবান করবে না। যথেষ্ট পরিমান থাকতে হবে যাতে হৃদয় আলোকিত হবে।

যেরূপ পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহরও প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হবে আর বান্দারও প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হবে, সর্বপ্রকার গুণাবলী তাদের মাঝে থাকবে।

তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হলে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মানুষ যেন মুক্ত থাকে। এমন অনেক মুসলমান রয়েছে যারা বলে থাকে, আমরা কি রোযা রাখি না, নামায পড়ি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব কথা দ্বারা তারা মুত্তাকী হতে পারে না। তাক্বওয়া ভিন্ন জিনিস। যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ খোদা তা'লাকে প্রধান্য না দিবে আর প্রত্যেক সম্পর্ক- তা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হোক বা জাতিয় অথবা বন্ধু কিংবা শহরের নেতৃবৃন্দের সাথে হোক; আল্লাহ তা'লার ভয়ে তা ছিন্ন না করবে আর আল্লাহ তা'লার খাতিরে সর্বপ্রকার বঞ্চনা সহ্য করতে প্রস্তুত না থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত সে মুত্তাকী হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে যেসব বড় বড় প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদের দেয়া হয়েছে তা এমন মুত্তাকীদের জন্য যারা যথাসাধ্য তাক্বওয়ার মানে উপনীত হওয়ায় সচেষ্ট। মানবীয় শক্তি সামর্থ্য যতটা তাদের ছিল সে অনুযায়ী তারা সর্বদা তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি তাদের শক্তি সামর্থ্যের ঘাটতি দেখা দেয় তখন তারা খোদা তা'লা কাছে আরো শক্তি যাচনা করে যেমনি কি-না "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন" থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইয়্যাকা না'বুদু অর্থাৎ আমরা তো নিজ সাধ্য অনুযায়ী কাজ করেছি আর সামান্যও অলসতা করিনি। ইয়্যাকা নাসতাইন অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তোমার কাছে নতুন শক্তি যাচনা করি। যেভাবে কবি হাফেয সিরাজী বলেছেন,

ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نَهَد لطفِ شما گامی چند

(উচ্চারণ: **মা বেদান মনযিলে আলী নাতাওয়ানীম রাসীদ, হাম মাগার পিশ নেহাদ লুতফে শুমা গামী চান্দ**) অর্থাৎ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত হতে পারব না যতক্ষণ তোমার অনুগ্রহ আমাদের সাথে না থাকবে।

অতএব, ভালোভাবে স্মরণ রাখবে, খোদা তা'লার কাছে মুত্তাকী হওয়া এক জিনিস আর মানুষের কাছে মুত্তাকী হওয়া আরেক জিনিস। হযরত মসীহ (আ.)-এর যুগে যেসব বিরোধী দল প্রভৃতি সৃষ্টি হত তার কারণও এটিই ছিল অর্থাৎ সাধারণ ইহুদীদের দৃষ্টিতে যারা স্বীকৃত ছিল এবং (যাদেরকে) মুত্তাকী ও পুণ্যবান মনে করা হত তারাই ছিল বিরোধী।
যদি তারা বিরোধী না হত তাহলে বিভিন্ন দল গঠিত হত না।

মহানবী (সা.)-এর যুগেও ছিল একই অবস্থা। আত্মশ্লাঘা, কৃপনতা, লোক দেখানো ও কপটতা প্রদর্শন এবং বড় লোকদের চাটুকারিতার মত বিষয়াদি ছিল যা তাদেরকে সত্য গ্রহণে বাধা দিয়ে রেখেছিল। মোটকথা, তাক্বওয়া এক কঠিন বিষয় যাকে আল্লাহ তা'লা তা প্রদান করে থাকেন

তার লক্ষণাবলীও সৃষ্টি করেন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সত্য যখন প্রকাশিত হয় তখন সেটিকে যে বিনা কারণে প্রত্যাখ্যান করে আর যৌক্তিক ও শাস্ত্রগত দলিল-প্রমাণাদি এবং খোদা তা'লার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখান করে- সে কীভাবে মুত্তাকী হতে পারে? প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সত্য যখন প্রকাশিত হয় তখন সেটিকে যে অযথা বিনা কারণে প্রত্যাখ্যান করে আর যুক্তিসঙ্গত ও অকাট্য দলিল প্রমাণাদী এবং খোদা তা'লার নিদর্শনসমূহকে অমান্য করে- সে কখনও মুত্তাকী হতে পারে না। মুত্তাকীর খোদার ভয়ে ভীত ও কম্পিত থাকা উচিত।

নিজের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

জগতে কি এমন কখনও ঘটেছে যে, চব্বিশ বছর যাবত একজন মানুষ রাতে পরিকল্পনা সাজায় আর সকালে খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করে বলে যে,এই ওহী ইলহাম আমি লাভ করেছি আর খোদা তা'লাও তাকে পাকড়াও করেন না? এভাবে তো জগতে নৈরাজ্য ছেয়ে যাবে আর সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। মুত্তাকী তো একটি বিষয় থেকেই উপকৃত হতে পারে আর এখানে তো হাজার হাজার (নিদর্শন) রয়েছে। যুগও একজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, হাদীসসমূহে মিনকুম মিনকুম বলছে, সুরা নূরেও মিনকুম লিখিত আছে ।

পাষাণ হৃদয় নিয়ে পশুর মতো যে জীবন কাটানো হচ্ছে– তা ভিন্ন একটি লক্ষণ, আবার বলতো যে, শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসেন– এখন (এই শতাব্দীরও) ২২বছর পার হয়ে গেছে।

এটি তখনকার কথা যখন (এই) বিবৃতি দিচ্ছিলেন।

চন্দ্র-সূর্যগ্রহণও হয়ে গেছে। প্লেগের প্রাদুর্ভাবও ঘটেছে, হজ্জও বন্ধ হয়েছে। এসব বিষয় দেখার পর এখনও যদি এরা না মানে তাহলে আমরা কীভাবে মানতে পারি যে, এদের মধ্যে তাক্বওয়া আছে।

এগুলো অ-আহমদীদের, যারা মুত্তাকী ও নেক হওয়ার দাবি করে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া নিয়ে মাতামাতি করে তাদেরকে (তিনি) এই উত্তর দিয়েছেন। এভাবে তারা (সরলমনা) লোকদেরও উত্তেজিত করে (এবং) তাদেরও নষ্ট করছে।

তিনি (আ.) বলেন, আমরা বার বার বলেছি; আসো এবং যেসব বিষয়ে তোমাদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে তা করো। কিন্তু এটি হবে না যে, পবিত্র কুরআন কিছু বলবে আর তোমরা ভিন্ন কিছু বলবে, আর এমন বক্তব্য উপস্থাপন করবে যা এর (অর্থাৎ কুরআনের)পরিপন্থী। ঈসা (আ.) স্বশরীরে আকাশ থেকে নেমে আসবেন বলে বিশ্বাস করো অথচ এটি তখনই সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে যদি প্রথমে (আকাশে) গিয়ে থাকেন। কুরআন ঈসার মৃত্যুর ঘোষণা দেয় অথচ এরা বলে, ছাদ ভেঙ্গে আকাশে চলে গেছে। একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে কুসংস্কারের পেছনে চলাই কি তাক্বওয়া। সত্যিকার তাক্বওয়ার পরিচয় কুরআন থেকে জানা যায় যে, দেখ! তাক্বওয়াশীল বা মুত্তাকীরা কি কাজ করেছে।

তাক্বওয়ার বরাতে জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে [তিনি (আ.)] বলেন, মুত্তাকীদের ওপর খোদার এক বিকাশ ঘটে, তারা খোদার ছায়া বা আশ্রয়ে থাকে, কিন্তু শর্ত হল, খাঁটি তাক্বওয়া হতে হবে আর এতে শয়তানের কোন অংশ যেন না থাকে, নতুবা খোদা তা'লা শির্ক পছন্দ করেন না। কিছু অংশ যদি শয়তানের হয় তাহলে খোদা তা'লা বলেন, পুরোটাই শয়তানের। [তিনি (আ.)] বলেন, আমরা আমাদের জামাতকে বলছি, তারা যেন কেবল এতটুকু নিয়েই অহংকার না করে যে, আমরা নামায-রোযা পালন করি অথবা বড় বড় অপরাধ অর্থাৎ, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি করি না। এসব বৈশিষ্ট্যে তো অধিকাংশ অ-আহমদী দলের লোক, মুশরিক প্রমুখরা তোমাদের সমঅংশীদার।

অর্থাৎ, এসব কাজ তারাও করে না।

তাক্বওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তা অর্জন করো। খোদার মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দাও। যার কর্মের মধ্যে সামান্য পরিমানও লোক-দেখানো ভাব থাকে খোদা তা'লা তার কর্মকে তার মুখেই ছুড়ে মারেন।

লোক-দেখানোর জন্য কোন কাজ করো না।

মুত্তাকী হওয়া কঠিন কাজ। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি তোমাকে বলে, তুমি কলম চুরি করেছ– তাহলে তুমি কেন রাগ করো?

কেউ ছোট কোন কথা বলে বসে যে, তুমি আমার কলম নিয়ে গেছ, তাহলে সে রাগান্বিত হয়– এটি মুত্তাকীদের চিহ্ন হয়, ধৈর্য ও উদ্যম প্রদর্শন করা উচিত।

{তিনি (আ.)} বলেন, তোমার সংযম তো কেবলমাত্র খোদার খাতিরে, তাই রাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। এই রাগ, এই ক্রোধের কারণ হল, (তোমার) আচরণ যথাযথ ছিল না, সত্যের পানে তোমার পদচারণা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থেই মানুষের ওপর বহু মৃত্যু না আসবে সে মুত্তাকী হতে পারে না। বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন এবং এলহামও তাক্বওয়ার (একটি) শাখা। আসল বিষয় হল তাক্বওয়া। এজন্য তোমরা এলহাম এবং রুইয়ার পেছনে লেগে থেকো না বরং তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টায় রত হও। এটি দেখো না যে, অমুকের প্রতি এলহাম হয়েছে, অমুক সত্য স্বপ্ন দেখেছে। বরং দেখ! তাক্বওয়া কাকে বলে? যে মুত্তাকী তার এলহামই সঠিক, আর তাক্বওয়া না থাকলে (তার) এলহামও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর মধ্যে শয়তানের অংশ থাকতে পারে। কারও এলহামপ্রাপ্তির বিষয়টি দ্বারা তার তাক্বওয়াকে শনাক্ত করো না বরং তার তাক্বওয়ার মানদণ্ডে তার এলহামকে যাচাই করো এবং বিবেচনা করো। সবদিক থেকে চোখ বন্ধ করে প্রথমে তাক্বওয়ার সোপান অতিক্রম করো। [তিনি (আ.)] বলেন, (পৃথিবীতে) যত নবী এসেছেন (তাদের) সবার উদ্দেশ্য ছিল তাক্বওয়ার পথ দেখানো। إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ কিন্তু পবিত্র কুরআন তাক্বওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথগুলো শিখিয়েছে। শ্রেষ্ঠ নবী শ্রেষ্ঠ উম্মতের দাবি রাখে। মহানবী (সা.) যেহেতু খাতামান্ নবীঈন (সা.) ছিলেন, একারণেই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলো পরম মার্গে পৌঁছেছে। নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্টগুলো পরম মার্গে পৌঁছতেই (শরীয়ত বাহী) নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটে। যে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে চায়

এবং অলৌকিক নিদর্শন দেখার বাসনা রাখে তার উচিত, নিজের জীবনকেও অসাধারণ বা অলৌকিক নিদর্শন দেখার যোগ্য করে গড়ে তোলা। দেখ! পরীক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রম করে, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত লোকদের ন্যায় অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই, তাক্বওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সব ধরণের কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। মানুষ যখন এপথে বিচরণ আরম্ভ করে তখন শয়তান তার ওপর বড় বড় আক্রমন করে কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে শয়তান অবশেষে ক্ষান্ত দেয়। এটি হল সেই সময় যখন মানুষের হীন জীবনের ওপর মৃত্যু এসে সে খোদার ছায়াতলে এসে যায়। আমাদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত মর্ম হল, মানুষের উচিত নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্য খোদার পথে লাগিয়ে দেয়া।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্য থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করেছি যাতে তাক্বওয়ার অর্থ এবং এর গভীরতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভ হয় আর আমরা, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাঁর জামাতভুক্ত হয়ে তাক্বওয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে তা অনুসরণ করি। রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে যতটুকু সম্ভব আমাদের চেষ্টা করা উচিত, (আমরা যেন) তাক্বওয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)